আমার দেখা মুক্তিযুদ্ধ

আবিদ রেজা

হঠাৎ গুলির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মা আমাদেরকে বাড়ীর পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে বলছেন। আমি আর আমার সেজো ভাই দু'জন হাত ধরে বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ী থেকে অল্প একটু দুরে যেতেই বেশ কিছু পাকিস্তানী সৈন্যের সামনে পড়তে হলো। একজন বলে উঠলো 'ঘরমে যাও'। তারা আমাদের দু'জনকে আর ঐ রাস্তা দিয়ে যেতে দিলো না। একটু পিছনের দিকে এসেই একটা বাড়ীর গলির রাস্তা দিয়ে আমরা দু'জন খুব দ্রুত মা'র কথামতো পাশের গ্রামের রমজান দাদার বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম।

আমাদের বাড়ী বগুড়া জেলার কাহালু উপজেলার ধানপুজা গ্রামে। ধানপুজা গ্রামের পাশ দিয়েই বয়ে গেছে একটা ছোট্ট নদী, যার নাম নাগর নদী। নাগর নদীর পাড়েই আমাদের বাড়ী। চার ভাই, দুই বোন আর বাবা-মা এই নিয়েই আমাদের পরিবার।

১৯৭১ সাল। আমি তখন খুব ছোট। একটু একটু বুঝতে শিখেছি। মা'র হাত ধরে প্রাইমারী স্কুলে যাই। স্কুলে ১, ২ লিখি, নামতা পড়ি আর স্কুল শেষে আবার মা'র হাত ধরে বাড়ী ফিরে আসি। হঠাৎ করে স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। বাবাও স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। রাতে রেডিওতে খবর শোনা, গ্রামের ক'জন চাচা'রাও আসতেন ঠিক সেই খবরের সময়েই। কোথায় যেন কিছু একটা হচ্ছে এটা বুঝতে পারছি। একদিন বাবা কয়েকজনকে বুঝাচ্ছেন কিভাবে ভারতে যেতে হবে। কিভাবে কোন দিক দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাওয়া যাবে তাও বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আবার সতর্ক করে দিয়ে বলছেন যখন কোন রেল লাইন ক্রস করতে হবে তখন খুব সাবধানে রেল লাইন ক্রস করতে বলছেন এবং কিভাবে তা করতে হবে তাও বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ভারতে যাওয়ার জন্য দিনের বেলাতে চলাচল না করে রাতের বেলাতেই চলাচল করতে নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি। আমার চাচা নজরুল ইসলাম, আমাদের গ্রামের বালা চাচা, আসমত চাচা, কলি চাচা, আশরাফ চাচা আর চারপাশের গ্রামের বেশ ক'জন মিলে সবাই প্রস্তুত হয়ে গেলেন ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেওয়ার জন্য। বেশ বড় একটা দল হয়ে গেল।

আমার বড় ভাই আলী রেজা (হেলাল)। তিনি ১৯৭১ সালে বগুড়া সরকারী আযিযুল হক কলেজের ভুগোল (সম্মান)-এর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। যখন সবাই ভারতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। তখন তিনিও মাথায় বুদ্ধি খেটে মাকে বলেছিলেন, যেহেতু দেশে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে- লেখাপড়া বন্ধ। তাই ভারতে গিয়ে তিনি কোন কলেজে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করবেন। সময় নষ্ট করবেন না। মা ভাইয়ের কথায় রাজি হয়ে গেলেন। আর যেহেতু আমাদের চাচা'রা এই মুহুর্তেই সবাই ভারতে যাচ্ছেন- সুতরাং তাদের সাথেই রওনা দিবেন সেটাও জানালেন। এক সংগে গেলে রাস্তায় কোন অসুবিধা হলে চাচা'রা তা দেখবেন। আর ভারতে যাওয়ার পর তো আর কোন অসুবিধা হবেই না। কেননা মা-র সহকর্মী ফনী নন্দ্র লাল চাকী স্যার উনার আত্মীয়র বাসাতেই উঠবেন বড় ভাই। একদম সব ঠিকঠাক করা হয়ে গেল। স্যার একটা চিরকুট লিখে দিয়েছিলেন বড় ভাইয়ের হাতে। ঐ চিরকুটটি তাঁর আত্মীয়কে দিলেই তিনি সবকিছু ঠিকঠাক করে দিবেন। মা বললেন - ঠিক আছে কিন্তু খুব সাবধানে যাবি আর কোন সময় নষ্ট করবি না। কিছু টাকা পয়সা আর কিছু শুকনো খাবার চিড়া-মুড়ি-গুড় নিয়ে বড় ভাই সবার সংগে রওয়ানা দিলেন ভারতের উদ্দেশ্যে।

প্রায় ৩ মাস চলে গেল কারো কোন খবর নেই। ভারতে কোথায় গেল? ফনী নন্দ্র লাল চাকী স্যারের আত্মীয়র বাসায় বড় ভাই উঠেননি। সেটা জানা গেল কিন্তু কোথায় আছেন তা জানা যাচ্ছে না। যখনই যে কেউই ভারতে গেছেন তাঁকে মা অনুরোধ করেছেন বড় ভাই-এর সংগে দেখা হলে বলতে যেন বাড়ীতে যোগাযোগ করে কিংবা কোথায় আছে জানাতে। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। কারোও সংগেই ভাই-এর দেখা হয়নি। হঠাৎ করে ৯ জুলাই বিকেল ৫ টার দিকে ভাই গ্রামের বাড়ীতে এসে উপস্থিত। হাতে একটা ব্যাগ। চুলগুলো উঁসকো-খুঁসকো। চেহারায় আর সেই উজ্জ্বলতা নেই। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছিলো চরম সাহসী এক যুবক। পুরোপুরি পরিবর্তন। মনে হয় যেন নিমিষেই পাহাড় সমান করে রাজপথ তৈরি করতে পারেন। মা যখন ভাই-এর ব্যাগটা ধরে বললো- আয় ঘরে আয়, চেহারাটা কেমন করেছিস। তখনই ভাই বলে উঠলো ব্যাগটা ধরছো কেন মা? কিছু খেতে দাও, আর কিছু খাবার সংগে দাও। এখনি চলে যাবো। সংগে অনেক লোক আছে।

মা'র আর বুঝতে বাকি রলো না। কিন্তু মা ভাইকে তখনই যেতে দিলেন না। অগত্যা ভাই বললেন একটু অপেক্ষা করো। আমি বাহির থেকে আসি। এই বলে বাড়ী থেকে বের হয়ে কিছুদুরে একটা জঙ্গল আছে সেখানে গেলেন এবং তারপর ফিরে আসলেন। ফিরে এসে মাকে বললেন ঠিক আছে কিন্তু আমাকে রাত ২ টার ভিতরেই চলে যেতে হবে। মা বললেন - রাত ২টা ! ঘুমাবি না। কিসের ঘুম মা। যেখানে পাকি'রা নির্বিচারে মানুষ মারছে সেখানে কিসের ঘুম মা? আগে বাঁচতে হবে- দেশটা স্বাধীন হতে হবে- তারপর ঘুম। এই প্রথম মা'র মুখের উপর চটপট করে কথা বললেন বড় ভাই।

বিকেলে খেয়েই বড় ভাই ঘুমোতে গেলেন, তাঁর ঘরে। কেননা রাত ২ টার মধ্যেই তিনি আবার রওয়ানা দিবেন। বড় ভাই-এর ঘরটি বাড়ীর এক পাশে আর আমাদের ঘর অন্য পাশে। বাড়ীর মাঝে একটি ছোট প্রাচীর ও দরজা ছিলো। বড় ভাই এর সংগে কারোই তেমন কোন কথাই হলো না। তিনি সোজা ঘুমাতে গেলেন। হয়তো খুব কম ঘুম হয়েছে কয়েক দিন। কিংবা তার ঘুমোতে খুব ইচ্ছে করছে। এদিকে মা সবাইকে বলে দিলেন - জোরে কথা না বলার জন্য কিংবা কোন শব্দ যাতে না হয়। কারণ বড় ভাই ঘুমাচ্ছেন।

৯ জুলাই-এর রাত তখন ১১টার মতো হবে। আমরা সবাই ঘুমিয়ে ছিলাম। কিন্তু মা জেগেছিলেন। ঠিক এমন সময়ে একটা ট্রেন এসেছিলো বগুড়ার দিক থেকে তালোড়া বাজারে। বগুড়া থেকে তালোড়া বাজারের দূরত্ব প্রায় ১২ কিলোমিটার এবং বগুড়া শহর থেকে তা পশ্চিম দিকে। আর তালোড়া বাজার থেকে ধানপুজা গ্রামে পায়ে হেঁটে আসতে বড়জোর ১০/১২ মিনিট সময় লাগে। এই সময়ে কখানো কোন ট্রেন আসে না। হয়তো কোন কারণে কোন ট্রেন এসেছে- এমনটিই ভেবেছিলেন মা। কিন্তু কিছু পরেই যখন অবিরাম গুলিবর্ষণ শুরু হলো তখন বুঝতে আর বাঁকি রলো না যে পাক-হানাদাররা বাড়ী আক্রমণ করেছে। আমরা সবাই ঘুম থেকে উঠে পড়লাম। বাড়ীর পিছনের দরজা দিয়ে প্রথমেই আমি আর আমার সেজো ভাই পালিয়ে গেলাম পাশের গ্রামে। কিন্তু বড় ভাই যে ঘরে ছিলেন সে অংশ থেকে বাড়ীর মাঝখানের প্রাচীর ও দরজা পেরিয়ে বাড়ীর পিছনের দরজায় আসার সুযোগ ছিলো কিন্তু পাক-হানাদাররা ইতিমধ্যেই এ জায়গায় ঢুকে পড়েছে। তাই যা হবার তাই হয়েছিলো। পাক-হানাদার বাহিনী বড় ভাইয়ের বাম পেটে একটা বেয়োনট চার্জ করে আর অসংখ্য গুলি করে আমার বড় ভাইয়ের বুকের উপর। তখন পাশে দাঁড়ানো ছিলো তালোড়া চৌধুরী পাড়ার তাঁরা মিঞা, লুৎফর মোল্লা, আজিজুল হক মোল্লা সহ বেশ ক'জন রাজাকার। দু'হাত দিয়ে বড় ভাই বাম পেট ধরে ছিলেন এবং বাড়ীর সিড়ির নীচে সারারাত পড়েছিলেন। ঐ রাতে বৃষ্টিও হচ্ছিল। সারারাত শরীরের উপর দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ায় - শরীরটা একদম ফ্যাঁকাশে হয়ে গিয়েছিলো। সারাটা গ্রাম জুড়ে পাক-হানাদারদের তান্ডব চলে পুরোটা রাত। আমাদের বাড়ীতে তান্ডব চালোনোর পর। পাশের বাড়ীতে যখন পাক-হানাদার ও রাজাকাররা ঢুকতে যায়। তখন প্রথম ঢুকে তাঁরা মিঞা আর সংগে সংগে গুলি চালায় টুডু চাচা। মাটিতে ঢলে পড়ে তাঁরা রাজাকার। হঠাৎ করে তাঁরা রাজাকার মাটিতে ঢলে পড়ায় পাক-হানাদাররা একটু পিছনে সরে আসে। ঠিক এই সময়ে টুডু চাচাসহ অন্যান্যরা ঐ বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে পাশের গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেন। টুডু চাচা ছিলেন আনসারের একজন অফিসার। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পরই তিনি অস্ত্রসহ পালিয়ে আসেন।

সারারাত এভাবে পুরোটা গ্রামে তান্ডব চালিয়ে সকালের দিকে পাক-হানাদাররা তালোড়া বাজারের হাইস্কুলে যেয়ে ক্যাম্প করে বসলো। সংগে নিয়ে গেল তারা রাজাকারের লাশ। পাক-হানাদাররা তার লাশ চৌধুরী পাড়ায় পাঠিয়ে দিয়েছিলো।

আর এদিকে আমরা সকালে পাক-হানাদাররা গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বাড়িতে এসে স্তব্ধ সবাই। মা কয়েক বার বড় ভাইয়ের লাশের উপর পড়ে গুনতে শুরু করলেন কয়টা গুলি করেছে। যতবারই গুনতে গিয়েছেন ততবারই অজ্ঞান হয়ে গেছেন আমার মা। বড় ভাই সে রাতে যে শার্ট, গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে ঘুমিয়েছিলেন। সেই বেয়োনেট চার্জ করা আর গুলিতে ছিদ্র সেই রক্ত মাখা শার্ট, গেঞ্জি আর লুঙ্গি আজও আমাদের বাড়ীতে আছে। এখন মা নেই, বাবাও নেই। তবে ঐ বেয়নোট চার্জ করা শার্ট, গেঞ্জি আর লুঙ্গি এখনো আছে।

২/১ ঘন্টার ভিতরেই আশপাশের গ্রাম ও আমাদের গ্রামের লোকেরা মিলে ধানপুজা গ্রামের মসজিদের পাশেই বড় ভাইকে চিরশায়িত করা হলো। খুব তাড়াতাড়ি গ্রাম ছেড়ে চলে হতে হবে। কেননা তালোড়া বাজারে যেহেতু পাক-হানাদাররা ক্যাম্প করে বসেছে- সুতরাং যে কোন সময় আবার চলে আসতে পারে হানাদাররা। এই প্রথম পাক-হানাদারদের ক্যাম্প হলো ১০ই জুলাই-এ তালোড়া হাই স্কুলে।

তাড়াহুড়ো করে কবরের ব্যবস্থা করা হলো। বড় ভাইয়ের কবর যেই মাত্র শেষ করা হয়েছে। ঠিক সেই সময়েই খবর আসলো পাক-হানাদাররা আবার আসছে। ঐ কবরস্থান থেকেই সবাইকে নিয়ে শুরু হলো দৌড়ানো। সবাই মিলে আমরা এখন চলে যাচ্ছি দক্ষিণের গ্রামে-অনেক দূরে। রাস্তার যেতে যেতে বাবা-মা ঠিক করলেন। বাবার বন্ধু বাহার চাচা থাকেন দক্ষিণের এক গ্রামে সেখানেই আপাতত উঠতে হবে। আর এতো দক্ষিণের গ্রামে পাক-হানাদাররা আসবে না। এই এতোটাই সান্ত্বনা।

বেশ কিছুদিন বাহার চাচার বাড়ীতে থাকার পর ওখান থেকে অন্যত্র যাওয়ার দরকার হলো। খবর পাওয়া গেল যে কিছু রাজাকারকে পাক-হানাদাররা এই দক্ষিণের গ্রামেও পাঠাতে পারে; আমাদের পরিবারের সবাইকে ধরে পাক-হানাদারদের ক্যাম্পে নিয়ে যেতে। ১০ জুলাইয়ে তালোড়া হাইস্কুলে ক্যাম্প করার পর পাক-হানাদাররা বেশ কিছু যুবককে ধরে নিয়ে গিয়ে রাজাকার হিসেবে কাজ করতে বলে। আবার কেউ কেউ স্বইচ্ছায় রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেয়। তবে ৯ জুলাইয়ের আগেই যারা পাক-হানাদারদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতো এবং বগুড়া থেকে তালোড়া বাজারে যারা পাক-হানাদারদের আনলো তাদের কথা একটু পরে বলবো। ৯ জুলাইয়ে যখন মুক্তিযোদ্ধারা তালোড়া বাজারে আসে তখন সেই সময়কার কিছু কুচক্রী মুসলিম লীগ পার্টির কয়েকজন নেতা ও তাদের দোসরা খুব তাড়াতাড়ি বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে খবর দেয় এবং রাতেই পাক-হানাদারদের নিয়ে এসে এই হত্যাকান্ড চালায়। কারা কারা এই হত্যাকান্ডে জড়িত ছিলো তা আমরা পরে জানতে পারি।

যেহেতু খবর পাওয়া গেল এই দক্ষিণের গ্রামেও রাজাকাররা আসতে পারে। তাই বাহার চাচার বাড়ীতে আর থাকা যাবে না। খুব তড়িৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো আজ রাতেই লুকিয়ে এই বাড়ী থেকে দূরের আরেক গ্রামে বাবার পরিচিত আর এক বন্ধুর বাড়ীতে উঠবো আমরা। কিন্তু সেখানে যেয়ে আমাদের এক তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো। বাবার সেই বন্ধু বলেই ফেললেন, দেখ - মোস্তফা তুমি আমার বন্ধু ঠিকই। কিন্তু আমার সমস্যা আছে। জীবনের হুমকি। আমি তোমাকে জায়গা দিলে- পাক-হানাদাররা এখানেও চলে আসবে। তখন আর আমার বাঁচার উপায় থাকবে না। রাত তখন প্রায় শেষের দিকে। মা-বাবা বুঝতে পারছিলেন না কি করবেন। সংগে ছিলেন ঈমান চাচা। ঈমান চাচা আমাদের বাড়ীতেই থাকতেন। কাজ করতেন । হাট-বাজার করতেন। একই পরিবারের সদস্যদের মতো ছিলেন ঈমান চাচা। এ অবস্থা দেখে ঈমান চাচা একটু ক্ষেপে গেলেন। বললেন ঠিক আছে। আমি ব্যবস্থা করছি। ঐ গ্রামের পাশেই একটা পাঠ ক্ষেত- ঠিক হলো বাকিটা রাত ঐ পাঠ ক্ষেতেই কাঠিয়ে দেয়া হবে, তারপর দিনের বেলাতে সবাই মিলে- আরও দূরের একটি গ্রামে ঈমান চাচার আত্মীয়র বাড়ীতে গিয়ে উঠবো আমরা সবাই।

সকাল হলে রওয়ানা দেয়া হলো ঈমান চাচার আত্মীয়র বাড়ীর দিকে। বর্ষাকাল। রাস্তা শেষ হয় না। কোথাও ভাঙ্গা রাস্তা। কোথাও নালা। কোথাও ডোবা। কোথাও এক কোমর পানি। এভাবে যেতে যেতে প্রায় দুপুর হয়ে গেল। ঈমান চাচার আত্মীয়র বাড়ীতে যাওয়ার পর - মনে হলো যাক অন্ততঃ বসার জায়গা পাওয়া গেল।

ঈমান চাচার আত্মীয় খুব গরীব মানুষ। দুবেলা দুমুঠো ভাত জোগাড় করা তার জন্য ছিল খুব কঠিন ব্যাপার। আমরা যখন ১০ জুলাইয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে আসলাম। তখন ঈমান চাচাই পাশের বাড়ীর চাচাদেরকে বলেছিলেন আমাদের বাড়ীর যত ধান, চাল আছে তা যেন তাদের বাড়ীতে নিয়ে রাখে। কিন্তু পরের দিনই ঈমান চাচা আমাদের বাড়ীতে গিয়ে গরুর গাড়িতে করে ঐ সমস্ত ধান, চাল আর মা'র কাছ থেকে চাবি নিয়ে যে আলমারীতে টাকা থাকতো তা নিয়ে এসেছিলেন। কিছু ধান, চাল ঈমান চাচার বাড়ীতে আর কিছু বাহার চাচার বাড়ীতে আর টাকাগুলো মাকে দিয়েছিলেন। এবার আবার ঈমান চাচাকে পাঠানো হলো তার বাড়ীতে যে সমস্ত ধান, চাল আছে সেগুলো নিয়ে আসতে। এবং এই বাড়ীতে আমরা প্রায় নভেম্বরের শেষ অবধি ছিলাম। তারপরও মাঝে মাঝে মনে কোন সন্দেহ হলেই মা সবাইকে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় রাখতেন । এক্ষেত্রে আমার জীবনে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটে। যখন সবাইকে মা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় রাখতেন। তখন মা ঠিক করেছিলেন ঐ গ্রামেরই এক ভিখারীনিকে। আমি তার কাছে থাকতাম। ঐ ভিখারীনিকে মা বলেছিলেন যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে ছেলেটা কার তখন বলবে তোমার ছেলে। কিন্তু তখন আমি ভাবতাম তাই কি হয়? আমার মতো একজন ছেলে কি করে একজন ভিখারীনির ছেলে হয়, কিভাবে মানুষ বিশ্বাস করবে। এতো মোটা-সোটা স্বাস্থ্যবান ছেলে কি কোন ভিখারীনির হয়? যা হোক যখন মা আমাকে মাঝে মাঝে ঐ ভিখারীনির কাছে রাখতেন তখন অবশ্য ছেঁড়া জামা-কাপড় পড়িয়ে দিতেন। পায়ে স্যান্ডেল থাকতো না। কিছু জামা-কাপড় ছেঁড়া এবং ময়লা করা ছিলো, যেগুলো মা ইচ্ছে করেই করে রেখেছিলেন। বিপদের সময় পরার জন্য।

নভেম্বরের মাঝামাঝি। খবর পাওয়া গেল পাক-হানাদাররা কিছুদিনের মধ্যেই তালোড়া হাই স্কুল থেকে চলে যাবে। খবরটা আসার পর বাবা এ.বি.এম. শাহজাহান ভাইয়ের সংগে যোগাযোগ করলেন। এবং জানলেন পাক-হানাদাররা চলে গেলে বাড়ীতে ফেরত যাওয়া যাবে কিনা। কেননা হানাদাররা চলে গেলেও তাদের দোসর আর রাজাকাররা তো থেকেই যাচ্ছে। শাহজাহান ভাই জানালেন তার ব্যবস্থা কয়েকদিনের মধ্যেই করে ফেলবো। কোন অসুবিধা নাই। তবে ডিসেম্বরের আগে বাড়ীতে যাওয়ার দরকার নেই।

এ.বি.এম. শাহজাহান ছিলেন তালোড়া এলাকার একজন সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা এবং তার সংগে প্রায় ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করেছেন বিভিন্ন জায়গায়। দেশ স্বাধীন হবার পর কিছুদিন তিনি আত্মগোপন করে ছিলেন। তিনি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের একজন সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হোন। এ.বি.এম. শাহজাহান বাংলাদেশের পাট প্রতিমন্ত্রী হিসেবেও কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেন।

গ্রামের বাড়ী ধানপুজাতে আর কয়দিনের মধ্যেই আমরা ফিরে যাচ্ছি। সেটা আমি জানালাম আমার ভিখারীনি মাকে। তার মনেও আনন্দ- আমি বাড়ী ফিরে যাচ্ছি, আমাদের কষ্টের দিন শেষ । সে বললো আমি তোমাকে দেখতে যাবো। আমি বললাম অবশ্যই। তোমার যখন খুশি তখন যাবে। তুমিতো অবশ্যই যাবে।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের কোন একদিন আমরা গ্রামের বাড়ী ধানপুজাতে চলে আসি। বাড়ী বললে ভুল হবে। বলতে হবে ভুতের বাড়ী। কিছুই ছিল না বাড়ীতে। এমনকি জানালা-দরজা পর্যন্ত ছিল না। উঠানে শেওলা, ঘরের দেওয়াল আধাভাঙ্গা, চারিদিকে ঘাস। বাড়ীতে থাকার মতো কোন অবস্থাই ছিল না। আপাততঃ পাশের বাড়ীতে উঠা হলো। কয়েক দিনের মধ্যেই বাড়ীটা মোটামুটি ঠিক করে নিয়ে তারপর নিজের বাড়ীতে উঠার কথা বললেন বাবা। ঈমান চাচা কাজ শুরু করে দিলেন, সংগে বাবর আলী চাচা এবং আর বেশ ক'জন। চার/ পাঁচ দিনের মধ্যেই বাড়ীটা কোনমতে থাকার উপযোগী করা হলো। একটা টিউবওয়েলের মাথা কিনে নিয়ে এসে বসানো হলো। কেননা ওটাও লুট হয়ে গিয়েছিলো। যা হোক নিজের বাড়ীতে এসে উঠলাম আমরা। এই বাড়ীতে রাতে মা কখনো ঘুমাতেন না। মনে হতো তিনি বাড়ী পাহারা দিচ্ছেন। ঈমান চাচা কিংবা বাবর আলী চাচা এই ঘুম, এই জাগা, আবার কখনো বসে বসে ঝিমানো, এভাবে সবাই রাত পার করতো। আমি রাতে যখনই জেগে উঠতাম তখন দেখতাম হয়তো কেউ বসে আছে অথবা কেউ হাটছে কিংবা ঝিমুচ্ছে। কিন্তু কাউকে ভীত মনে হতো না। মনে হতো কারো জন্য অপেক্ষা করছেন তারা।

কয়েক দিন আগেই পাক-হানাদাররা তালোড়া বাজার ছেড়ে চলে গেছে। রাজাকার, আলবদরা গা ঢাকা দিয়েছে। ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যরাত। হঠাৎ চিৎকারে আবারও মধ্যরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল- তবে কাউই ভীত-সন্ত্রস্ত নয়। ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাড়ীর ভিতরেও চিৎকার। ঈমান চাচা, বাবর আলী চাচা চিৎকার করে বলছেন - জয় বাংলা, জয় বাংলা। ঘুম থেকে উঠেই মাকে বললাম- মা শাহজাহান ভাই, আসমত চাচা, কলি চাচা, আশরাফ চাচা . . . -রা এসেছেন। মা বললেন - হ্যাঁ, ঐ তো ওদের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি, ওরা বাহিরের রাস্তা দিয়ে তালোড়া বাজারের দিকে যাচ্ছে। রাস্তায় প্রচুর মানুষের যাতায়াত বুঝা যাচ্ছিলো- তারাও জোরে জোরে জয় বাংলা, জয় বাংলা বলছিলেন। হঠাৎ করে বাড়ীর দরজায় কে যেন ধাক্কা দিলো। কিছু জিজ্ঞেস না করেই মা দরজা খুলে দিলেন। মনে কোন ভয়ই যেন নেই। দেখি আসমত চাচা আরও ক'জন। মাকে বললেন- ভাবী অনেক ভাত-তরকারি রান্না করবেন- আমরা সকালের দিকে আসছি। মা তখন কাঁদছিলেন। কথাটা বলেই আসমত চাচা তাঁর মুখ চেপে ধরে দৌঁড় দিলেন সংগে অন্যান্যরাও। আসমত চাচার দুই কাঁধে দুটো রাইফেল ছিলো। আর অন্য সবার কাছে ছিলো একটা করে কাঠের রাইফেল, শুধু একজনের কাছে কিছু ছিলো না কিন্তু পিঠে কিসের যেন একটা ছোট বস্তার মতো ছিলো।

মুক্তিযোদ্ধারা তাদের নিজের নিজের এলাকা ভাগ করে নিয়েছিলো রাজাকারদের ধরার জন্য। আমাদের এলাকায় শাহজাহান ভাই ও তার দলের মুক্তিযোদ্ধারা এসেছিলো রাজাকারদের ধরতে। সকাল বেলা প্রায় ২৫ জনের মতো রাজাকারকে ধরে নিয়ে শাহজাহান ভাই ও তার দলের মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের বাড়ীর উঠোনে এসে হাজির হলো। সবার হাত বাঁধা, পিঠ মোড়া দেয়া । মুক্তিযোদ্ধারা দেশে যুদ্ধচলাকালীন কোন রাজাকার কি করেছে, সেটা একজন রাজাকারকে দিয়ে অন্য রাজাকারের অপকর্মের কথা জেনে নিচ্ছিলেন। সংগে সংগে বিচারও হচ্ছিলো। তারা যে মানুষের উপর এই দীর্ঘ কয়েক মাস নির্যাতন করেছে, তার জন্য আজকে তাদের সাজা পেতে হচ্ছে। প্রায় ৫০ জনের মতো মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকারদের কাছ থেকে বের করছিলেন, কে কোথায় খুন এবং লুট তারাজ করেছে। কেন তারা আমার বড় ভাইকে মারলো? তাছাড়া এই গ্রাম এলাকায় আরো ৩ জনকে কেন খুন করা হলো? কে কে হিন্দু প্রধান ধলাহার গ্রাম এবং তালোড়া বাজারের হিন্দু ও মাড়োয়ারিদের বাসায় লুট-তারাজ করেছে ইত্যাদি তাদের কাছ থেকে জেনে নেয়া হচ্ছে। রাজাকাররা যে অত্যাচার করেছিলো তাদের সাজা তারা তখন পাচ্ছিলো। বাড়ীর উঠোনে এরকম অবস্থা দেখে মা বললেন - তোমার সবাই এখান থেকে অন্য কোথায় যাও। যাই করো না কেন- আমার ছেলে তো আর কোনদিন ফেরত আসবে না। শাহজাহান ভাই চিকৎকার করে বলে উঠলো- খালা তোমার অসুবিধা হলে তুমি অন্য বাড়ীতে চলে যাও।

যা হোক সবচেয়ে কঠিন বিচার হয়েছিলো লুৎফর মোল্লার। আর বিচারটি করেছিলো তারই সন্তান লালু মোল্লা। লুৎফর মোল্লা ছিলো একজন রাজাকার কিন্তু লালু মোল্লা রাজাকার ছিলো না। বিজয়ের দিনে মুক্তিযোদ্ধারা দু'জনকেই ধরে নিয়ে এসেছিলেন। তাই লালু মোল্লা একবার অনেক কষ্টে মুক্তিযোদ্ধাদের বললো- 'ভাই আমি তো রাজাকার ছিলাম না, তোমরা আমাকে ধরলে কেন'? মুক্তিযোদ্ধারা বললো - তোর বাপ তো রাজাকার ছিলো। লালু মোল্লা আবারও বললো কিন্তু আমি তো রাজাকার নই। তখন মুক্তিযোদ্ধারা তাকে বললো ঠিক আছে - তাহলে তোর বাপের বিচার তুইই কর। তোর বাপের কি করা উচিত তুই বল। তোর বাপ এই এলাকার অনেক ধ্বংসযজ্ঞের হোতা। বিচার তাহলে তুইই কর। লালু মোল্লা বললো- আমি কি বিচার করবো। আপনারই বিচার করেন। তখন মুক্তিযোদ্ধারা বললো, যেহেতু তোর বাবা হত্যাকান্ডসহ লুটতারাজ এবং পাক-হানাদারদের সহযোগিতা করেছে সুতরাং একমাত্র মৃত্যুদন্ডই তার শাস্তি। যদি আমাদের বিচার সঠিক হয় তাহলে- তুই তোর বাপের সামনে দাঁড়িয়ে বল- '৭১ সালে খুন, লুটতারাজ আর নারী ধর্ষণের সহযোগিতা করার জন্য তোমাকে মৃতুদন্ড দেয়া হলো এবং তা কার্যকরি হবে এখনই। লালু মোল্লা - তার বাবার সামনে কোন মতে দাঁড়িয়ে বললো '....... তোমার মৃতুদন্ডই হওয়া উচিত বাবা'। আর কেউ দেরি করলো না। ক'জন মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর মোল্লাকে বাড়ীর পাশে নদীর পাড়ে নিয়ে গেল। আমরা বাড়ী থেকে ৩টি গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। বোঝা গেল মৃত্যুদন্ড কার্যকর হলো। লালু মোল্লা তখন দুচোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়েছিলো। তার একটু পর লালু মোল্লাকে ছেড়ে দেয়া হলো। তাকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। আর বাকী প্রায় ২৩ জনের মতো রাজাকারদের সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ী থেকে নিয়ে যাওয়া হলো। তাদের কি করা হয়েছে তা আজও জানি না। তাদের আমি আর কোনদিন দেখিনি। যাবার সময় শাহজাহান ভাই মাকে বলে গেলেন - খালা কোন অসুবিধা হলে খুব তাড়াতাড়ি আমাকে খবর দিও।

তবে সবচেয়ে বড় রাজাকার আজিজুল হক মোল্লা - তাকে কেউ সেদিন ধরতে পারেনি। সে আগেই গা ঢাকা দিয়েছিলো । সে ছিলো ধূর্ত । সে অত্র এলাকার সব ঘটনার নায়ক ছিলো। এই আজিজুল হক মোল্লা-ই ৯ই জুলাই-এ মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি টের পেয়ে বগুড়া থেকে পাক-হানাদারদের এনে তালোড়া বাজার এবং আমাদের গ্রামে হামলা চালায়।

সবার ভাবনা ছিলো- একদিন এই আজিজুল হক মোল্লা আবার মাথা গজিয়ে উঠবে এবং প্রতিশোধের নেশায় মেতে উঠবে। তার একটা বড় কারণ মুক্তিযুদ্ধে হেরে যাওয়া আর তাছাড়া যে লুৎফর মোল্লাকে মুক্তিযোদ্ধারা মৃতুদন্ড দিল সেই লুৎফর মোল্লা আজিজুল হক মোল্লার সম্পর্কে ভাই। সেই ভাবনাটাই একদিন সত্যি হলো। ঘটনা বলতে গেলে দ্রুত পালটাতে থাকলো। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা। দেশে মার্শাল 'ল জারি। হ্যাঁ, না ভোট। এমন করতে করতে সবাই এগিয়ে যাচ্ছে। তারপর একদিন দেখা গেল বিএনপির টোকেন নিয়ে সেই '৭১ এর রাজাকার আজিজুল হক মোল্লা সংসদ নির্বাচনে দাঁড়ালো এবং নির্বাচিতও হয়ে গেল। একজন রাজাকার হয়ে গেলেন মাননীয় সংসদ সদস্য। আজিজুল হক মোল্লা এখন আর বেঁচে নেই। তবে তাঁর ছেলে সেই একই সংগঠনের টোকেন নিয়ে নির্বাচন করে তিনিও এখন এমপি। তবে এখানেই শেষ নয়। যারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন- বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন। সেই আসমত চাচাকে এই রাজাকাররা মিথ্যা মামলা দিয়ে ১৪ বছর জেলে বন্ধ করে রেখেছিলেন। আর কলি চাচার অবস্থাও ঐ একই রকম হয়েছিলো। তিনিও জেল খেটেছেন প্রায় ৭ বছরের মতো কারণ একই। মিথ্যা মামলা। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজাকারের ক্ষমতার অপব্যবহার আর '৭১-এর প্রতিশোধ।

আমার বড় ভাই শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আলী রেজা (হেলাল)-এর ডায়েরীতে একটা কথা লিখা ছিলো। আজও আমার তা স্পষ্ট মনে আছে। চমৎকার একটা লেখা। লেখাটা আমাকে খুব কষ্ট দেয়। অনেক সময় আমি এলোমেলো হয়ে যায়। শহীদদের কোন কিছুরই দাম আমরা দিতে পারলাম না। ডায়েরীতে সুন্দর স্পষ্টাক্ষরে লিখা ছিলো - 'পশ্চিমা ইয়াহিয়া আর তার দোসরা বাংলাদেশে যে ধ্বংসযজ্ঞ আর হত্যাকান্ড চালাচ্ছে তা বাংলাদেশের ইতিহাসে এমনভাবে লিখে রাখতে হবে যেন বাংলাদেশীরা পশ্চিমা ইয়াহিয়া ও তার বংশধরদের শেয়াল-কুকুরের পর্যায় ফেলে'। সেই ইতিহাস তো লেখা হলোই না। বরং হচ্ছে তার উল্টোটা। চলছে ইতিহাস বিকৃতির নগ্ন উৎসব। স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস আমরা লিখতে পারলাম কোথায়? হঠাৎ করে একটা ভাঙ্গা টেবিলের উপর উঠে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করা যদি স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়। তাহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস কোথায় যায় ভেবে দেখুন? এটি সবাই জানেন যে, সে সময় তিনি এমভি সোয়াত জাহাজ থেকে

পাক-হানাদারদের অস্ত্র খালাসের জন্য রওনা হয়েছিলেন। যে লোক পাকিস্তানের অস্ত্র খালাসের জন্য রওয়ানা হয়েছিলেন তাঁকে দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করানো হলো কেন তা একটু ভাবলেই বোঝা যাবে ! এবং যে ঘোষণা ইতিপূর্বে চট্টগ্রাম বেতার থেকে আব্দুল হান্নান কর্তৃক ক'বার প্রচারিতও হয়েছিলো। একটা জাতিকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট ধাপ পার করতে হয়। বাঙ্গালী জাতি সেই ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে অতিক্রম করেছিল। ২৩ বৎসরের পাকিস্তানী শাসকদের শোষন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে জাতির সঠিক সময়ে প্রতিবাদ, ৫২ ভাষা আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা আন্দোলন, ৭০-এর নির্বাচনে জনগণের ম্যান্ডেট অর্জন, ৭ই মার্চের সঠিক দিক-নির্দেশনা, ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যথাসময়ে স্বাধীনতা ঘোষণা, ১০ই এপ্রিলের সরকার গঠন এবং ১৭ই এপ্রিলের শপথ গ্রহণ; এগুলো বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের মৌলিক ধাপ।

মুক্তিযুদ্ধের বয়স প্রায় তিন যুগের কাছাকাছি। মুক্তিযুদ্ধ এখন একজন পরিপূর্ণ যুবক কিন্তু সে যুবক আজো শুনে মিথ্যাচার। আর এদিকে নাগর নদী দিয়ে অনেক পানি গড়িয়ে গেছে। সেই পানি বঙ্গোপসাগর সাগর হয়ে আটলান্টিকে এসেছে। আমি এখন নিউইয়র্ক প্রবাসী আজ প্রায় আট বছর। হয়তো আর কখনো বাংলাদেশে ফেরা হবে না। কিন্তু যখন দেখি ইতিহাস বিকৃতির উন্মাদনা চলছে - তখন বড়ই এলোমেলো হয়ে যায়। তবে অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলতে চাই ' মিথ্যার সাথে আপোষ নয় '। এবং ইতিহাস একদিন সঠিক কথাই বলবে - কারণ ইতিহাস কখনো মিথ্যাকে ধারণ করে না।

আবিদ রেজা, নিউইয়র্ক, ডিসেম্বর ১, ২০০৪